বাংলার হুমায়ূন

মখদুম আজম মাশরাফী

১৯৭৪ সালে ঢাকা ভর্সিটির বোটানীতে পড়তাম। কার্জন হল এলাকার লাল ইটের বিল্ডিংগুলি ছিল আমাদের তীর্থ এলাকা। ক্যামিষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টে আমাদের সাবসিডিয়ারী ক্লাস নিতেন সে ডিপর্টিমেন্টের চেয়ারম্যান ডঃ মহব্বত আলী স্যার। সেই ডিপার্টমেন্টের তৎকালিন ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত তর"ন ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। লেখালেখির পোকা আমার মাথায় ছিল সব সময়ই। বই পড়ার অভ্যাসও আশৈশব। কবিতা ও প্রবন্ধের প্রতি যত না নেশা, উপন্যাসের প্রতি ছিল অনেক কম। মনে পড়ে ফজলুল হক হলের বন্ধুর র"মে "নন্দিত নরক" চটি বইটি তে জড়ানো কাগজের ফিতায় লেখা "শ্রেষ্ট উপন্যাস পুরস্কার প্রাপ্ত" হাতে নিয়ে চোখ বুলাতে থাকি। কি আর্শ্চয্য যেন মনে হতে থাকে সব কথা আমারই কথা। সব কিছুই আমার চারিদিকের জীবন ছবি।

ফরিদপুরের সন্ড়ান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হুমায়ূন সম্পর্কে বলেছেন, হুমায়ূনের পাঠক জনপ্রিয়তা শরৎচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এখানে কিছু ব্যপার লক্ষনীয়। যে কালে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় ছিলেন সে কালে তার লেখায় ছিল সে কালিন বাঙালির জীবন ছবি। কিন্তু একটি বিখ্যাত ব্যতিক্রম "মহেষ" ছাড়া মুসলিম বাঙালি জীবনের ছবি নয়। যে ক'জন মুসলিম তাদের লেখায় মুসলিম জীবনের ছবি র"পায়ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁরাও আম জীবনের ছবি আঁকতে পারেননি, যেমন করে তা আঁকতে পারঙ্গম হলেন হুমায়ূন আহমেদ। বলা যায় তিনি তার রসায়ন বিজ্ঞানকে জীবন রসের ফল্গুতে র"পায়িত করে নিবিড় বাংলাদেশের চলচ্ছবি একে গেছেন। এটা হয়েছিল কোন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোন থেকে নয় । বরং হয়েছিল সত্যনিষ্ঠ জীবনধারা চিত্রায়নের স্বতস্ফূর্ত সৃষ্টিশীলতা থেকে।

আবার ১৯৪৭ পরবর্তি পূর্ব পাকিস্ড়ানীদের জীবনে বাঙালি হিসেবে বেঁচে থাকার ছিল এক বন্ধ্যা সময়। একদিকে বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে কলকাতার প্রভাব , অন্যদিকে উর্দূভাষী তাহাজ্জুদ-তমুদ্দুনের ঠেলায় কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষীন শিখাটি। মার খাওয়া সৈনিকের মত তবুও অনেক লেখক বয়ে নিয়েছেন সে নিভোন্মুখ অমর মশাল। সৈয়দ ওয়ালিউলণ্ঢাহ, শওকত ওসমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রমুখের সাধনা শুধু জ্বলন্ড়ই রাখেনি সে মশাল, তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন বাংলাদেশের এক দুর্বিনীত নিজস্ব সাহিত্যধারা।

যাই হোক, এক সদা হাসিমুখ সাহসী মানুষ হুমায়ূন সহসাই অসুখের কাছে খুব সহজেই হেরে হেলেন। তার আশৈশব আশংকাটিই সত্য হল। স্কুল জীবনে সহপাঠিদের কাছ থেকে সম্রাট হুমায়ূনের যুদ্ধ পরাজয়ের গণ্ঢানি একই নামের কারনে তাঁকেই সইতে হত। যদিও ক্ষনজন্মা সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল তাঁর সৃষ্টিসুখে ভরা, আনন্দে-সুন্দরে সৌর্য্যময়। না,

মৃত্যু তো কোন যবনিকা নয়, এ শুধু এক প্রস্থান। এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে। কে জানে মানুষের পূনর্জন্ম ঘটে কিনা। আধ্যাত্ব বিশ্বাস বলে, আত্মার র"পান্ড়র হয়, মৃত্যু হয় না। তা অমর। সৃষ্টি বিশ্বে স্রষ্টা অমর। দেহান্ড়রে সৃষ্টির বিনাশ হয় না। সৃষ্টির শক্তিতেই বেঁচে থাকেন দেহান্ড়রী।

নিজেকে প্রশ্ন করি হুমায়ূন আমাদের কে? উত্তর পাই, তিনি নিজেকে আমাদের আয়না করে তুলেছিলেন। তিনি হয়ে উঠলেন বাঙালি জীবনের দর্পণ, দোতরার সুর আর ভাটফুলের ঘ্রান। তার সৃষ্টিতেই সে প্রতিচছবি বিম্বিত হয়ে আছে। সাহিত্য মানে তো সহিততা। তার মানে সাথে থাকার নিবিড়তা, নিবিষ্টতাই সাহিত্যের সাফল্য। বাংলাদেশের গণমানুষের জীবন যাত্রার র"প-রস, সুর-ঘ্রান সবই বাঙময় হয়ে আছে হুমায়ূনে। তাই তিনি না থেকেও থাকবেন। বীজ যেমন বৃক্ষ সৃষ্টি করেও বীজের মধ্যে বেঁচে থাকে, শিখা যেমন শিখান্ড়রে অসংখ্য আলোয় ছড়িয়ে যায় অনন্ড়, তেমনি সৃষ্টিশীল ব্যক্তির শেষ হয় না।

পাঠকের অনুভবে খাপেখাপে মিলে গেলে সে রচনা উর্ত্তীন হতে বাধ্য। যেমন প্রার্থনার শঙ্খধ্বনির সুরের সাথে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ছিল, এবার যুক্ত হল প্রভাতী-সান্ধ্য আযানের সুর। নমস্কারের পাশে যুক্ত হল স্ণ্টামালেকুম সম্বোধন। কাসর ঘন্টা-পুজো অর্চনার পাশেযুক্ত হল মিলাদ-কোরান পাঠের পবিত্র ধ্বনি । প্রায় সব বাংলাদেশের মানুষের জীবনের দৈনন্দিন এই বাস্ড়বতা। এ গুলি এ দেশের মানুষের প্রানের অন্ড়র্গত। এ গুলি ধর্মের অনুষঙ্গের চেয়ে জীবন বাস্ড়বতার অনুষঙ্গ। যা সহজেই পাঠককে ছুয়ে যায়, প্রানাত্মা স্পর্শ করে। যে সাহিত্যের সঙ্গে আমরা দীর্ঘদিন পরিচিত তাতে আর্শ্চয্যজনক ভাবে এই বাস্ড়ব পটভূমির অনুপস্থিতি ততদিন পর্য্যন্ড় লক্ষনীয় হয়ে ওঠেনি যতদিন না কেউ এসে সে বাস্ড়বতা অঙ্কন করেননি, যেমন জনপ্রিয় ভাবে করেছেন হুমায়ুন আহমেদ। সে প্রিয়তার একটি মূখ্য কারনও হল সে বাস্ড়বতা যা পাঠকের খুব নিজস্ব বলে মনে হয়। না এ বিশেণ্ডষন কোন ভাবেই দীর্ঘদিনের সাহিত্য ধারাকে অবমূল্যায়ন বা বেঠিক বলার প্রয়াস নয়। এ হলো হুমায়ূন ও তার মত লেখকদের পাঠক প্রিয়তার একটি বিশেষ দিকের উন্মোচনের প্রয়াস। বলতে দ্বিধা নেই আমাদের কালজয়ী বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল মহাপুর"ষদের রচনা পাঠ করে বাঙালি সমাজের এক পিঠ অনুভব করা যায় মাত্র, কিন্ড়ু অন্য পিঠটি পিপাসার আর্তিতে অপঠিত, অযুক্ত থেকে যায় । বাংলাদেশের মানূষ তবুও পাঠ সুধা পান করে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে। কারন বাঙালিত্বের গৌরব এ মাটির মানুষের প্রশ্নাতীত ভাবেই বিশ্বস্ড় ও প্রোথিত। বলা যায় যতদিন শামসুর রহমান লেখেননি, "জায়নামাজের উদার জমিন" ততদিন অতৃপ্ত তৃষ্ণাকাতর এ দেশের মানুষের জন্যে বুকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরার সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি। যতদিন হুমায়ূন নন্দিত নরকের দ্বার উন্মোচন করেন নি ততদিন এই "নরকে" প্রবেশের শৈলী প্রধান সাহিত্য পূর"ষদের জানা ছিল না । যতদিন হুমায়ূন আহমেদ শঙ্খনীল কারাগারের গল্প বলেন নি, ততদিন কালজয়ী বাংলা সাহিত্য সম্ভারে কখনও সে গল্প লেখা হয় নি।তিনি এলেন, অপঠিত জীবনের পাঠ উন্মোচন করলেন

সৃষ্টির সীমাহীন প্রান্ড়রে একে একে গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, ছায়াছবিতে। তার গণমূখীনতা আর চলচ্ছবির মত জীবন চিত্র আঁকার প্রগাঢ় সংবেদনশীলতার সাথে বিস্তৃত পাঠকের সে সৃষ্টিতে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ পাঠককে করে তোলে পাঠপাগল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবেচনায় পশ্চিম বাংলায় হুমায়ূনের পাঠক সংখ্যা কম। এর কারনও সেই পূর্বোক্ত সত্য, তাঁর রচনা সৃষ্টির পটভূমি, কর্ষন-ক্ষেত্রে, জীবনচিত্রের বিশ্বাসনিষ্ঠ চিত্রায়ন। হুমায়ূনের প্রয়ানে পশ্চিম বাংলার নিশ্চুপ আর শীতল প্রতিক্রিয়ায় সুনীল দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তার কারনও সেই একই সত্য, শুধু বিপরীত। তার রচনায় স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিম বঙ্গীয় জীবনের চিত্রায়ন নেই। আর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য কর্মে যে জীবনচিত্রে বাঙালি চির অভ্যস্ড় তার বাঁক ঘুরে গেছে জীবন বাস্ড়বতার অলি গলি আনাচে কানাচে। যেখানে পশ্চিম বঙ্গীয়রা অভ্যস্ড় নন।

যদিও অষ্ট্রেলিয়ান, মার্কিনী আর বিলেতীদের ভাষা এক, ইংরেজি, তবু ,এদের সাহিত্য কিন্তু আলাদা। হ্যানরী লওসন, পিটার বেনজো কিংবা ডেভিড মালুফ ইরেজি ভাষার অস্ট্রেলিয়ান কবি। তাঁদের সাহিত্য অষ্ট্রেলিয়া জীবনের রূপকার। একজন বিলেতবাসী বা মার্কিন পাঠকের কাছে এদের যে সাহিত্য মূল্য আছে, একজন অষ্ট্রেলিয়ানের কাছে তার সাহিত্যিক ও সামাজিক অর্থে আপন জীবন নির্ভর সাহিত্যের অনেক বেশী আবেদন আছে। অথবা আরও বলা যায়, স্পেনের মূল ভুখন্ডের সাহিত্যের বিষয় উপাদান, চিত্রভঙ্গি স্পানিশ ভাষায় রচিত দক্ষিন আমেরিকার দেশগুলির সাহিত্য থেকে স্পষ্টভাবে ভিন্ন। গৃহ যুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্তি এদেশে নতুন ধারার সাহিত্য সৃষ্টি করে। আবার উর্দুভাষায় রচিত মহাকবি ইকবাল অথবা কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের শের গুলি থেকে গালিবের শের গুলির স্পষ্ট ভিন্নতা আছে। অর্থাৎ মূল ভাষা মূলতঃ খুব জরুরী বিষয় নয়, জরুরী যা তা হল সাহিত্যের নিবিড়তা, জীবন নির্ভরতা আর উপযোগিতা তার পাঠকের নিজ মানস ও বিস্তৃত জীবন বিষয়ে। সেখানেই রচনা-শিল্পী হয়ে ওঠেন দেশ, জাতি ও মানুষের নিজস্ব। এই সব নিরিখে বলা যায় হুমায়ূন বাংলাদেশের গনমানুষের সাহিত্য স্রষ্টা ও রূপকার।

হুমায়ূন লিখেছেন তার অপছন্দের শব্দগুলির মধ্যে "আমি" শব্দ একটি। এ অ-আমিত্ব অর্জন অনেক সাধকের জন্যেও এক বিরাট কঠিন কাজ। হুমায়ূন নিজেকে সর্বভূতে দ্রবিভূত করার স্বকীয়তায় সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর দেখা, শোনা, শোঁকা, ছোঁয়া সব কিছুতেই এই বোধটি স্বতোৎসারিত ছিল। তাই তিনি ছিলেন জনারন্যে এক বোধিবৃক্ষ। না ভুল বললাম। জনারন্য ব্যপারটিতে কেমন একটা বুনো ভাব আছে। তার চেয়ে বলি জননন্দনে বা জনউদ্যানে। তিনি ছিলেন সেই সুরভিত উদ্যানের একটি সুরভী ব্যকুল বৃক্ষ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অনেক গুনী মানুষের আছে আত্মপ্রেম, আত্ম পুজার নিয়মিত আরাধনা। তাঁদের ভাবে ভঙ্গিতে তা উপস্থাপিত হয়ে থাকে। কেউ দাড়িতে,কেউ লম্বা চুলে, কেউ মাথা মুড়িয়ে, কেউ বিশিষ্ট টুপিতে-চশমায় তা ধারন করে থাকেন।তাঁরা নিজেদের গুনের উপাসনা নিজেই করেন,সবার মত অথবা সবার চেয়ে বেশী করে। সে কারনে একটা ভদ্র 'অহং' বোধের বিশিষ্ট মোড়কে তাঁরা সাধারন্যে আবৃত থাকেন। যেন কোন উঁচু টাওয়ারে চড়ে চারিদিকে অবলোকনের কাজ করেন তাঁরা। কিন্তু হুমায়ুন যেন জনসমুদ্রে অবগাহন করে অনুভব করেন সবার জীবন। তাই তাঁর ভাবে ভঙ্গীতে কোন রকম মেকী, দশের মধ্যে এগারো, ভাব ছিল না। যাঁরা তাকে জানেন তাঁরা জানেন তিনি কত ডাউন টু আর্থ নিরাভরন সাধারন মানুষ ছিলেন ।

হুমায়ূনের শব্দ ব্যবহার, রসিকতা,ভাষাভঙ্গি সবকিছুর মধ্যে বাংলাদেশের ছবি আঁকা। যেন তাঁর রসায়নের গুঢ় বিজ্ঞান সাহিত্য রসে সিঞ্চিত। যেমন ধর"ন রমজান মাসে বাংলাদেশের গ্রাম গ্রামান্ড়রে, শহর,নগরে সিয়াম সাধনা ও আনন্দ যাপনের যে সুখী ছবি, তা আকঁতে হুমায়ুনের অনুভব আর রসায়ন প্রয়োজন। ভোরের মসজিদে মসজিদে আযান নামাজিদের মসজিদ যাত্রা, তারাবিহ নামাজ, জুম্মার নামাজ এগুলি সংস্কৃতির অপরিহার্য্য অংশ। বাংলাদেশের সাহিত্যে এ গুলির সংবেদনশীল চিত্রায়ন ছাড়া সে চিত্র থেকে যায় অসম্পূর্ন। হুমায়ূনের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশীলতার চর্চা তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারন।
হুমায়ূন তাঁর কালের সমসায়িক ধারার ধারক ছিলেন। তিনি তা মন্থন করে মাখন তুলেছেন।আর সে মাখনের সুস্বাদু আহারে পরিপূর্ণ করেছেন তার সমকালিন সাহিত্য উপাচার।

সবাই জানেন ঢাকার প্রকৃত অধিবাসীর সংখ্যা অনেক কম। ঢাকাবাসীর সিংহভাগ পলণ্টী অঞ্চলে শৈশব, কৈশোর কাটিয়ে আসা অভিবাসী মানুষ দিয়ে গড়া। ইট পাথরের লোক গিজ গিজ নগর জীবনে বসবাস হলেও তাদের মনবাস ঠিকানা পড়ে থাকে গাঁয়ের সুশীতল আলোজল, ছায়া তলে। নগর জীবনে আকাশের দিকে দুদন্ড তাকিয়ে দেখার সুখেরও অবকাশ থাকে না কার"রও। মনের হু হুতাস কান্নাকে আড়াল করেও কেন জানি সবাই ভনিতা করে শহরবাসী বলে নিজেকে ঠকাতে ভালবাসেন। এ এক জটিল মনস্ড়ত্বিক ব্যপার। এই স্ববিরোধিতা এক ধরনের মানসিক বৈকল্যের মত। কিন্তু হুমায়ূন ছিলেন এ ব্যপারে অকপট। পশ্চিম পৃথিবীতে দীর্ঘকাল জ্ঞানার্জন করেও সেই ভনিতা তাঁকে গ্রাস করেনি। তিনি তাই নুহ্াস পলণ্টীর বাগবাগিচা, পাখ-প্রকৃতির কাছে ফিরে মুক্ত করতেন তার নগরবেড়ী আর মনকারাগারের শৃঙ্খল। অবশেষে তাঁর শেষ শয্যাও সেই শ্যামলিমায় স্থায়ী হল।

হুমায়ূনের "ন" অক্ষরটি প্রিয়তার অনেক সুত্র ও প্রমান লক্ষ্য করার মত। তঁর সন্ড়ানদের বেশ ক'জনার নাম "ন" অক্ষর দিয়ে শুর" । তাঁর সিগনেচার প্রথম উপন্যাস "ন"ন্দিত নরকে। দ্বিতীয় উপন্যাসের শঙ্খটি "নী"ল। "ন" অক্ষরটির মধ্যে নেতিবাচক একধরনের

আবহ বোধ হয়। এই "কুন কুনে কষ্ট বোধটি" কি তা হলে ছিল তাঁর সৃষ্টির যন্ত্রনা? প্রসব যন্ত্রনা। তাঁর ভেঙ্গে পড়া প্রথম বাঁধা ঘর, অভিমানী সন্ড়্রনদের বিষন্ন দুরত্ব। এই বিষন্নতা বোধ করি তরল কষ্ট থেকে জমানো কঠিন শীতলতায় তাঁকে বিবমিষ করেছিল। এমনকি ভবিষ্যতের কষ্ট ও তাঁকে আবিষ্ট করেছিল তাঁর দুবছরের শিশু সন্ড়্রনের পিতৃস্মৃতিহীন হয়ে বেড়ে ওঠার সম্ভবনার কথা ভেবে।

আরেকটি বিষয় হল, লেখকের সামাজিক দায় বিষয়টি নানা বিতর্কে জটিল। তবে প্রাথমিক দায় হল পাঠক প্রিয় রচনা সৃষ্টি আর তার উঁচু মান ও রস নিয়ন্ত্রন করা। হুমায়ূন সে ক্ষেত্রে সর্বজন প্রিয়। পাঠকের বয়স ও শ্রেনী বিন্যাস নির্বিশেষে এই প্রিয়তার অধিকারী তিনি। টলষ্টয়, পুশকিনে বাম শ্রেনীর প্রতিফলন আছে বলে ধরা হয় । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পাঠকপ্রিয়, মনন মন্থক কবি। দর্শন তার লেখার নানান মোড়ে, বাঁকে উকি ঝুকি দিয়ে গেছে সহজ সাবলিল পরিবেশনায়। আঁতলামির কোন ভড়ং, অভিনয় নেই তাতে। কিন্তু কি আর্শ্চয্য, তিনি বাঙালি হয়েও, সর্বভারতীয় ব্যপ্ত হয়েও, এত বিশাল হয়েও, বাঙালি মুদ্রার এক পিঠে বিচরন করেছেন মাত্র। আরেক পিঠে বিচরনের তাঁর কোন কনফিডেন্স ছিল না বলে অনেকে ব্যখ্যা দিয়ে থাকেন। পাবলো নের"দা, নাজিম হিকমতও শ্রেনী দ্বন্দের কবি ছিলেন, নিপিড়িত মানুষের পক্ষ কণ্ঠ ছিলেন তাঁরা। নজর"ল ছিলেন প্রলংকর সাহসে দুর্বার মুক্তকণ্ঠ বজ্রবানীর কবি। শ্রেনীর দেয়াল গুড়িয়ে দিতে পল্টনের সৈনিক শিবির থেকে দাবড়িয়ে বেড়িয়েছেন তিনি বাংলার এপিঠ ওপিঠ। না হুমায়ূন কোন রাজনীতিক ছিলেন না । তিনি ছিলেন অবলোকক,অনুভবক,স্পর্শক শিল্পী। সেই অভিজ্ঞানের অনবরত সঞ্চয় তিনি সাজিয়ে রাখতেন তাঁর কথাসৃষ্টিতে, গল্প গ্রন্থনায়, চলচ্চিত্রমালায়। তাঁর গল্প ভঙ্গি ছিল সঘন কথোপকথন, তাঁর চলচ্চিত্র ছিল জীবনকাব্য। যে সমুদ্রে তিনি সাঁতার কাটতেন, যে জীবন জলে তিনি অবগাহন করতেন সেই সমুদ্র, সেই জীবনের ঘ্রান , র"প, স্পন্দন অকপটে অনুরনিত হত তাঁর সাবলিল শিল্পকর্মে, তাঁর সৃজন শৈলীতে । হূমায়ূন তাই বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন তিনি সুর্দীঘকাল ধরে।

মেলবর্ন, ২৫ জুলাই ২০১২
mushrafi@hotmail.com